গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা | ১৫ - ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মাও সে তুং স্মরণ

৯ সেপ্টেম্বর মহান নেতা মাও সে তুং-এর ৪৮তম প্রয়াণদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনের পাতায় দেখুন

ভারত হোক বা ইন্ডিয়া দেশের মানুষের জীবনের অন্ধকার ঘুচবে কি

বিধায়কদের অস্বাভাবিক বেতনবৃদ্ধি দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের চোখে অমানবিক

আবারও মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন ও ভাতা বিপুল পরিমাণে বাড়ালো রাজ্যের তৃণমূল সরকার। ৪০ হাজার টাকা করে বাড়িয়ে বিধায়কদের মাসিক ভাতা সহ বেতন হল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, প্রতিমন্ত্রীদের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা এবং পূর্ণমন্ত্রীদের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যবাসী স্তম্ভিত। মানুষ যখন ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধিতে দিশেহারা, নিশ্চিত রোজগার নেই, করবৃদ্ধি, ভাড়া বৃদ্ধিতে জেরবার হয়ে ভেবে পাচ্ছে না সংসার চালাবে কী করে, তখন সেই আর্থিক সঙ্কট লাঘবের কোনও চেষ্টা না করে নিতান্ত স্বার্থপরের মতো এঁরা নিজেরা নিজেদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে নিলেন! স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বিধায়ক-মন্ত্রীরা তো জনপ্রতিনিধি। জনগণ এঁদের নির্বাচিত করেছেন তাদের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ দেখার জন্য। অথচ সে সবের বদলে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেদের বেতন বাড়াতে! এ প্রশ্নও উঠছে, যে জনগণকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে তাঁরা নিজেদের বেতন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে নিলেন সেই টাকা তো এই বঞ্চিত জনগণের করের টাকা থেকেই আসছে। এঁদের কি তা হলে জনগণের প্রতিনিধি বলা চলে?

এই অমানবিক বেতনবৃদ্ধির সাফাই গাইতে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, দেশের অন্য রাজ্যগুলির বিধায়কদের সঙ্গে সমতা

দুয়ের পাতায় দেখুন

এই ভাতা বৃদ্ধি অনৈতিক

এস ইউ সি আই (সি)

রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

যখন জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের ফলে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপার্জন কমছে, সরকার নিজেই বারবার অর্থ সংকটের কথা বলছে ও সেই অজুহাতে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দিতে অস্বীকার করছে, আশা, আইসিডিএস সহ স্কিম ওয়ার্কার্সদের ন্যূনতম ভাতা দিতে পারছে না এবং লক্ষ

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় নীতিরই কার্বন কপি

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতার বাগাড়ম্বর করে এবং রাজ্যের শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য দুটি কমিটি গঠনের পর যা ঘোষণা করেছে, তা ভাষার সামান্য হেরফের ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র কার্বন কপি ছাড়া আর কিছু নয়।

শৈশবে দু-বছর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়ার পর, প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদি শিক্ষাকে 'দক্ষ বাংলা' নামে প্রচার করার কথা এতে বলা হয়েছে। অথচ বাস্তবে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য উপযুক্ত কোনও পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব এই শিক্ষানীতিতে নেই। এই শিক্ষানীতিতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি বাধ্যতামূলক না করে বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দি চাপানোর ষড়যন্ত্রকেই সাহায্য করা হবে। তা ছাড়া, অষ্টম শ্রেণি থেকে সেমিস্টার প্রথা চালু করার ফলে শিক্ষার বনিয়াদ দুর্বল হবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া

রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মেদিনীপুর শহরে ছাত্রবিক্ষোভ। ৯ সেপ্টেম্বর

ছয়ের পাতায় দেখুন

বস্তি গুঁড়িয়ে দারিদ্র আড়াল করা গেল কি

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত করবেন। আচ্ছা, শক্তিশালী অর্থনীতি বলতে প্রধানমন্ত্রী কি বুঝিয়েছেন— দেশের ১৪০ কোটি মানুষের আর্থিক উন্নয়ন? তাদের হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদের ব্যবস্থা? এমনটা যদি কেউ বোঝেন তবে তিনি ডাহা ভুল করবেন। যাঁরা এমনটা বোঝেন তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য জি-২০ সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে গত চার মাস ধরে দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র মানুষের বসতিগুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল মোদি-প্রশাসন। যেগুলি কোনও প্রকারে টিকে গেল সেগুলি ঢেকে দেওয়া হল পুরু কাপড় আর প্রধানমন্ত্রীর বিরাট বিরাট ছবি লাগানো কাটআউট দিয়ে। আর এ ভাবেই সম্মেলনে আসা বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের কাছে 'দারিদ্রমুক্ত' ভারতকে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী আর তার সরকার।

জি-২০

জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে বিদেশি অভ্যাগতদের চোখে 'উজ্জ্বল' ভারতের ছবি তুলে ধরতে শুধু দিল্লির সৌন্দর্যায়নেই খরচ করা হয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। রাস্তায় বসেছে লেজার আলো, বসেছে ফোয়ারা, নানা রকমের মূর্তি থেকে ফুলের টব, কয়েক দিনের মধ্যে পোঁতা হয়েছে কয়েক হাজার গাছ। দিল্লি সহ দেশের সর্বত্র টাঙানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখের ছবি সহ সুশোভিত পোস্টার। অন্যদিকে এই উজ্জ্বলতার উল্টো পিঠে যে বাস্তব ভারতের অন্ধকার চিত্র, তা ঢাকতে বলি দেওয়া হচ্ছে দিল্লির হাজার হাজার গরিব মানুষকে। তাদের ঝুপড়ি, বস্তি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে উচ্ছেদ করেছে সরকার, অথবা সদৃশ্য আচ্ছাদনে ঢেকে দিচ্ছে। চোখের সামনে একচিলতে আশ্রয়, নিত্যব্যবহার্য জিনিস গুঁড়িয়ে যেতে দেখে তারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছেন, আমরা কি মানুষ নই?

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিধায়কদের অস্বাভাবিক বেতনবৃদ্ধি

একের পাতার পর

আনতেই তাঁরা বিধায়ক-মন্ত্রীদের এতটা বেতন বাড়ালেন। হায় রে, সমতার কী অদ্ভুত নজির! এই মুখ্যমন্ত্রীই হয় কথায় নয় কথায় 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে'র নজির টানেন, আর বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর বেলাতেই তিনি অন্য রাজ্যের নজির টানলেন! তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর শুধু বিধায়কদের বেতনের সমতা আনতেই অন্য রাজ্যের কথা মনে পড়ল! অন্য বহু রাজ্য যে শিক্ষা, চিকিৎসা, আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে সে কথা তাঁর মনে এল না কেন? সেই ক্ষেত্রে সমতা আনার কথা তো তাঁর মুখে কখনও শোনা যায়নি।

প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী কেন শুধু বিধায়কদের বঞ্চনাই দেখতে পেলেন? এ রাজ্যে আশা, অঙ্গনওয়াড়িতে যে লক্ষ লক্ষ কর্মী ভিক্ষাতুল্য অনুদানে কাজ করছেন তাদের আর্থিক বঞ্চনার কথা একবারের জন্যও কেন তাঁর মনে পড়ল না? এ রাজ্যের মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন মাত্র দেড় হাজার টাকা। এই বঞ্চনা কি সরকারের চোখে পড়ে না? আরও বিস্ময়কর হল, তাঁদের ১২ মাসের বেতন দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় মাত্র দশ মাস। তা হলে বাকি দু'মাস তাঁরা কী খেয়ে বাঁচবেন, মুখ্যমন্ত্রী কখনও ভেবে দেখেছেন? আরও বঞ্চনার বিষয়, এ রাজ্যে গত ১১ বছর ধরে মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বাড়ানো হয়নি। বেতন বাড়ানো হচ্ছে না পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের। স্কুল-কলেজে হাজার হাজার অস্থায়ী শিক্ষক অধ্যাপক স্থায়ী অধ্যাপকদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বেতনে পড়াচ্ছেন। প্রশাসনের সমস্ত ক্ষেত্রে হাজার হাজার চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী অন্যায় রকমের কম বেতনে কাজ করছেন। তাঁদের বেতনে সমতা আনার কথা মুখ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে ভাবলেন না কেন? অন্য রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা যখন পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের থেকে অনেক বেশি ডিএ পাচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি অন্য রাজ্যের নজির মেনে সে ক্ষেত্রে সমতা আনার কথা ভাবলেন না কেন? লক্ষ লক্ষ শিক্ষক পদ শূন্য, নিয়োগ নেই, স্কুলে-কলেজে কে পড়াবে তার কোনও ঠিক নেই। এই যখন অবস্থা তখন মুখ্যমন্ত্রী সেই সব ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য টাকা বরাদ্দ না করে, মন্ত্রী-বিধায়কদের মাসিক বেতন দেড় লাখ টাকা করে দিলেন। চমৎকার রাজ্য শাসন! এ রাজ্যের অগ্রগতি রুখবে কে!

মুখ্যমন্ত্রী কথিত এ রাজ্যের 'বঞ্চিত' মন্ত্রী-বিধায়কদের আর্থিক পরিস্থিতি কি নুন-আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থায়? মন্ত্রী-বিধায়করা কি রাজ্যের সাধারণ মানুষকে জানাবেন, অনেক রেখেঢেকেও তাঁদের সম্পত্তির কী পরিমাণ তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করেছেন? এডিআর (অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিসার্চ) বহুবার নির্বাচন কমিশনের তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছে, নির্বাচিত বিধায়ক-সাংসদদের ৮০ শতাংশেরও বেশি কোটিপতি। বাকিরাও আশেপাশে। এই সমস্ত মন্ত্রী-বিধায়কদের অঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ যে বিপুল তা তাঁদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাতেই পরিষ্কার। এখন নির্বাচনে জিততে শাসক বা বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই কোটি কোটি টাকা ঢালে। স্বাভাবিক ভাবেই বিপুল টাকা বিনিয়োগ করে জেতা বিধায়কদের বেশিরভাগেরই লক্ষ্য থাকে এই বিনিয়োগকে বহু গুণ বাড়িয়ে ফিরিয়ে আনা। জনপ্রতিনিধি হিসাবে দেশসেবা, জনসেবার ছিটেফোঁটাও এই ভোটসর্বস্ব দলগুলির রাজনীতিতে কোথাও নেই। এ ছাড়া পাঁচ বছর ধরে আইনি-বেআইনি বিচিত্র পথে কোটি কোটি টাকা কামানোর দুর্নীতি চক্র চলছে। এহেন বিধায়কদের যদি বঞ্চিত বলা হয়, তা হলে বঞ্চনা শব্দের মানেই বদলে যায়।

বিধায়কদের বেতনবৃদ্ধি, ভাতা বৃদ্ধি কেবল তৃণমূলের শাসনেই হচ্ছে তা নয়। সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনে বারবার বিধায়কদের, বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার, প্রবোধ পুরকাইত, জয়কৃষ্ণ হালদার, পরবর্তী কালে বিধায়ক তরুণ নস্কর তার বিরোধিতা করেছেন। সংসদে কংগ্রেস সরকার যখন সাংসদদের বেতন ভাতা বাড়িয়েছে এসইউসিআই(সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল তার বিরোধিতা করে বর্ধিত বেতন নিতে অস্বীকার করেছেন। সংসদে তিনি ছিলেন এ বিষয়ে একক সোচ্চার কণ্ঠ। যে বিজেপি এ রাজ্যের বিধায়কদের বেতনবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলছে, সেই বিজেপির সাংসদরা সংসদে সেদিন বেতনবৃদ্ধির সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সাংসদদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়েছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী অন্য যে রাজ্যগুলির নজির টানলেন তার বেশিরভাগই তো বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম শাসিত। ফলে বিরোধী কারও ক্ষেত্রেই এই অন্যায় বেতনবৃদ্ধির প্রতিবাদ নীতিভিত্তিক নয়, কংগ্রেস-সিপিএম নেতারা যে এর প্রতিবাদ করছেন তা নিছকই রাজ্যে তাঁদের কোনও বিধায়ক নেই বলে।

চরম অমানবিক, দৃষ্টিকটু এবং স্বৈরাচারী কায়দায় জনপ্রতিনিধিদের বেতন বাড়ানোর ঘটনায় সাধারণ মানুষ প্রবল ক্ষুব্ধ। শুধু ক্ষোভ নয়, সর্বত্র বিধায়ক-মন্ত্রীদের প্রশ্ন করতে হবে, কেন তাঁরা জনগণকে চরম দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে এমন স্বার্থপরের মতো নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিলেন? তাই সর্বত্র দাবি উঠুক— রাজ্যের বিধায়কদের যদি দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত সরকারি কর্মচারী, আধা সরকারি কর্মচারী মানুষের প্রতি কোনও সহমর্মিতা থাকে তবে যতক্ষণ না তাঁদের বেতন মানুষের বেঁচে থাকার মতো হচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত তাঁদের বিধানসভা এলাকায় একজন মানুষও অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থাকবে ততদিন নিজেদের বেতন বাড়ানো থেকে তাঁরা বিরত থাকুন। যদি তাঁরা প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হন, তা হলে এই অনৈতিক বেতনবৃদ্ধি প্রত্যাখ্যান করুন।

ভাতা বৃদ্ধি অনৈতিক

একের পাতার পর

লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ স্থগিত রয়েছে তখন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও বিধায়কদের মাসিক ভাতা সহ বেতন এক ধাক্কায় চল্লিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১,২১,০০০ টাকা, ১,৪৯,৫০০ টাকা এবং ১,৫০,০০০ টাকা করা কোন জনস্বার্থের প্রতিফলন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে নিজেদের আখের গোছানোর জন্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে হাতিয়ার করছে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। আমরা এই অনৈতিক এবং চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি।

বস্তি গুঁড়িয়ে দারিদ্র আড়াল করা গেল কি

একের পাতার পর

অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে আশ্রয়হীন, রোজগারহীন অসংখ্য মানুষের। এমনকি ফুটপাথবাসীদের জন্য শীত ও বর্ষায় মাথা গোঁজার ঠাঁই 'রেন বসেরা' (রাত্রি নিবাস)— তাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফ্লাইওভারের তলায় ঘুমনো মলিন চেহারার হতদরিদ্রদের উচ্ছেদ করে ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে শহর। সব আয়োজনের একটাই উদ্দেশ্য, বিদেশি প্রতিনিধিরা যাতে ভারতের দারিদ্র দেখতে না পায়। দিল্লির দারিদ্র আড়াল করতে কয়েক দিনের মধ্যেই সরকার খরচ করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া বস্তিতে অসহায় শিশুরা

শুধু তাই নয়, ৮-১০ সেপ্টেম্বর দিল্লির একটা বড় অংশে কার্যত লকডাউন ঘোষিত হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সেনাবাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে রাখা হয়েছে দিল্লির বাসিন্দাদের। স্কুল-কলেজ-দোকানপাট-অফিস-আদালত সব বন্ধ। ওই তিন দিন সবাইকে ঘরের মধ্যে থাকার নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসন। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ দু'বেলা না বেরোলে যাদের পেটে গামছা বেঁধে থাকতে হয়, তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। দিল্লির নানা বস্তি এলাকা, ফুটপাত ছাড়াও দিল্লি লাগোয়া নয়ডা এলাকার বস্তিও ঢেকে দেওয়া হয়েছে ত্রিপল দিয়ে। মেট্রো স্টেশন সহ রাস্তার দু'পাশের দোকানদারদের বাধ্য করা হয়েছে ধার করে হলেও দোকান রঙ করতে। যদিও সেই দোকান ওই তিন দিন খোলা চলবে না। জি-২০কে 'জনসাধারণের আন্দোলন' বলে অভিহিত করেছে বিজেপি সরকার, বস্তি উচ্ছেদ করেই কি তারা জনসাধারণকে যুক্ত করলেন!

এই বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ঝুপড়ি, দোকান ভাঙার কাজ শুরু হয়। ১ এপ্রিল থেকে চার মাসে দিল্লি জুড়ে ৪৫টি উচ্ছেদ অভিযান চলেছে। ঝুপড়িবাসীদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন তাদের বেআইনি জবরদখলকারী বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারি জমি খালি করার নামে জি-২০ কে অজুহাত করে বুলডোজার দিয়ে চলছে উচ্ছেদ অভিযান। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দিল্লির ২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪৭ হাজার মানুষ গৃহহীন ছিল। বাস্তবে সংখ্যাটা দেড় লক্ষের কাছাকাছি। তাঁদের জন্য অস্থায়ী মাথা গোঁজার ঠাঁইও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই উচ্ছেদ অভিযানে আরও লক্ষাধিক মানুষ গৃহহারা হলেন।

কাজের আশায় সারা ভারত থেকেই বহু দরিদ্র মানুষ দিল্লির ফুটপাতে, ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়ে দিন গুজরান করেন। সরকারি, বেসরকারি নানা কাজ সম্পন্ন করতে ঠিকাদাররা এদের উপরই ভরসা করে। বহু উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ভরসাও এরাই। সেই গৃহহীন মানুষগুলির রুটি-রুজি বন্ধ হওয়ায় দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটানোও দুষ্কর। এরা থাকবে কোথায়, খাবে কী— তা নিয়ে প্রশাসন বা সরকারের কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

আসলে ভারতে জি-২০ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকার চাইছে একদিকে আমেরিকা-চিনের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক সুপার-পাওয়ার হিসেবে বিশ্ববাণিজ্যে ফয়দা তুলতে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কম দামে তেল ও অস্ত্রের ব্যবসা বাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে পেশি আস্ফালন করতে। আসলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শক্তিশালী অর্থনীতি মানে শক্তিশালী একচেটিয়া পুঁজি। দেশের মানুষের দৈন্যদশা নিয়ে সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

একদিকে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্রে জর্জরিত দেশের মানুষ, অন্যদিকে বিজেপির জাত-পাত-সম্প্রদায়ের বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। শাসক বিজেপি সম্পর্কে মানুষ মোহমুক্ত হচ্ছে, তা বিজেপি নেতাদের অজানা নয়। নিজেদের ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও যাতে উজ্জ্বল করা যায়, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে যাতে জি-২০-র চাকচিক্য দিয়ে ঢাকা যায়, তার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। শুধু বিদেশিদের সামনে নয়, জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছে দেশের মানুষেরও।

কিন্তু পারল কি ঢাকতে? ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপানের বড় বড় সংবাদপত্রে বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার খবর ছেপেছে। তাতে রয়েছে রাজধানীর দরিদ্র বস্তির করুণ বিবরণ। স্বাভাবিক ভাবেই শত চেষ্টাতেও দারিদ্রের বাস্তব চিত্র ঢাকা যায়নি। সুদৃশ্য ত্রিপলের টুকরো ফাঁক দিয়ে তা ঠিক বেরিয়ে এসেছে।

ভারত হোক বা ইন্ডিয়া
দেশের মানুষের জীবনের অন্ধকার ঘুচবে কি

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন দেশের নাম থেকে ইন্ডিয়া কথাটিকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে। সদ্য শেষ হওয়া জি-২০ সম্মেলনের নেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' বাতিল করে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'। ইন্ডিয়া শব্দটি নাকি বিদেশি শব্দ, এর গায়ে নাকি উপনিবেশবাদী গন্ধ লেগে রয়েছে। বিজেপি নেতারা আরও বলছেন, ইন্ডিয়া শব্দটি বিভিন্ন ভারতবিরোধী নাশকতামূলক শক্তির নামের সঙ্গেও যুক্ত। তাই দেশের নাম হিসাবে ইন্ডিয়া নাকি আর এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা উচিত নয়।

বিজেপি নেতাদের এ হেন তৎপরতায় স্বাভাবিক ভাবেই দেশের মানুষের মনে প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে যে, জনজীবনের গুরুতর সমস্যাগুলির কি সবই সমাধান করে ফেলেছে বিজেপি সরকার? মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই, শিক্ষা-চিকিৎসার সমস্যাগুলি কি তা হলে আর মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা নেই? তাই কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এখন দেশের নাম পরিবর্তনের কাজে মেতেছে? মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা বলছে, সমাধান হওয়া দূরের কথা, যত দিন যাচ্ছে সরকারি নীতির কুফল হিসাবে সমস্যার বোঝা মানুষের ঘাড়ে আরও ভারি হয়ে চেপে বসছে এবং জনজীবনের এ সব সমস্যাগুলির কোনওটির সঙ্গেই দেশের নাম যুক্ত নয়। মানুষ তাদের ইচ্ছা এবং সুবিধামতো দেশের নাম হিসাবে ইন্ডিয়া বা ভারত দুটোকেই ব্যবহার করেছে বা করে। কখনও এটিকে একটি সমস্যা বলে তাদের মনে হয়নি। তবে বিজেপি নেতাদের কেন হঠাৎ সব ছেড়ে দেশের নাম নিয়ে পড়তে হল?

তা ছাড়া, গত ৯ বছরের শাসনকালে নরেন্দ্র মোদিরা নাম পরিবর্তনের 'মহান' কাজ তো কম কিছু করেননি! ভারতে মুসলমান শাসনের ঐতিহাসিক সত্যকে কালি ঢেলে ঢেকে দেওয়ার অপচেষ্টায় ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত বহু স্থানের নাম তাঁরা বদলে দিয়েছেন। ইসলামি নামের বদলে হিন্দুধর্মীয় নামের পত্তন করে হিন্দুপ্রেমী সাজার চেষ্টার কিছু কসুর করেননি। কিন্তু কী হয়েছে তা দিয়ে? এ ভাবে ঐতিহাসিক সত্য মুছে দেওয়া যায় না, যাবেও না। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁদের তথাকথিত এই হিন্দুধর্ম-প্রেমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনেরই বা কতটুকু উন্নতি ঘটেছে? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশ হিসেবে অন্যান্য ধর্মের মানুষের মতো তাঁরাও তো জ্বলছেন খিদের আগুনে, বেকারত্বের যন্ত্রণায়। ঝলসে যাচ্ছেন মূল্যবৃদ্ধির আঁচে। 'ইন্ডিয়া' পাল্টে 'ভারত' নাম ব্যবহার করলে এই সব জ্বলন্ত সমস্যার একটিরও সমাধান হবে কি?

আসলে বিজেপি নেতাদের সমস্যাটা দেশের নাম নিয়ে নয়, দেশের মানুষকে নিয়ে, মানুষের মনে জমা হওয়া বিক্ষোভ নিয়ে। কেন্দ্রে বিজেপির দু-দফার শাসনে জনজীবনের এমন কোনও সমস্যা নেই যেটির তারা কিছুমাত্র সুরাহা করতে পেরেছে। বরং মূল্যবৃদ্ধি থেকে বেকারত্ব, শিক্ষা থেকে চিকিৎসার সমস্যা সবই গুরুতর আকার নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার মতো ঝুলিতে তাঁদের কিছুই নেই। এই প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিজেপি নেতারা বারে বারে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কোনওটিই কার্যকর করেননি। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে, বেকারত্ব গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সীমা ছুঁয়েছে, ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালিকদের মুনাফা অটুট রাখতে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকারকে তাদের পায়ে বলি দিয়ে ৪৪টি শ্রম কোডকে ৪টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। দলিত সহ নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার অতীতের সব সীমা ছাড়িয়েছে। মণিপুর সহ দেশের নানা প্রান্তে জাতিগত দাঙ্গা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার বিজেপি শাসনে অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। নানা অছিলায় মুসলিমদের ওপর অত্যাচার এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। দেশজুড়ে প্রশ্ন উঠছে, এই সব জনবিরোধী কাজ ছাড়া গত ৯ বছরে মোদি সরকার আর কী করেছে?

এই ব্যর্থতার কাঁটা বিজেপি নেতাদের ভালই বিঁধছে। কারণ তাদের সমর্থন যারা করে তারা তো সব টাটা-বিড়লা নয়। সাধারণ মানুষ— চাষি, মজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত। অথচ নতুন কোনও প্রতিশ্রুতির স্তোক দিয়ে যে জনগণের ক্ষোভকে আর স্তিমিত করা যাচ্ছে না তাও তারা টের পাচ্ছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যখন বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ঠিক একই রকম ভাবে মানুষ প্রবল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তখন সেই ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে বিজেপি নেতারা পুলওয়ামার ঘটনা এবং বালাকোটে সেনা অভিযানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একই তাস দু'বার খেলা যাবে না। তাই এ বার রামমন্দির উদ্বোধনের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি হঠাৎ দেশের নাম বদলের নাটক শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা, যাতে দেশ জুড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগকে উস্কে তোলা যায়।

বিজেপি নেতারা যদি সত্যিই দেশের নাম বদল করতে চান তবে সবার আগে তো তাদের এই নিয়ে জাতীয় বিতর্কের ডাক দেওয়া দরকার ছিল। জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন ছিল। বিরোধী দলগুলির মত নেওয়ার দরকার ছিল। এ সব কোনও কিছুই না করে একতরফা ভাবে বিজেপি নেতারা দেশের নাম বদলের সিদ্ধান্ত শুধু ঘোষণা করে দিলেন তাই নয়, আন্তর্জাতিক ফোরামে পর্যন্ত তা ব্যবহার করে দিলেন। এটা গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তা ছাড়া এই নাম বদল করতে হলে সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল এনে তা পাশ করাতে হবে। কারণ সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদেই রয়েছে, 'ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত, শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অফ স্টেটস'। কাজেই এই ইচ্ছামতো নাম পরিবর্তন সংবিধান বিরোধীও বটে।

ইন্ডিয়া নামটি ব্রিটিশের দেওয়া, বিজেপি নেতাদের এই অভিযোগেরও কোনও সারবত্তা নেই। প্রথমত, সংবিধান পরিষদের সভায় দেশের নাম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পরই 'ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ, ভারত' এই বাক্যাংশ সংবিধানে যুক্ত করা হয়। তাই স্বাধীন দেশের ইন্ডিয়া নামটি ব্রিটিশ নয়, ভারতীয়দেরই যুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, যে বিজেপি নেতারা আজ ঔপনিবেশিকতা-সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী হওয়ার ভাব দেখাচ্ছেন, দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জেলে যাচ্ছিলেন, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করছিলেন, প্রাণ দিচ্ছিলেন, তখন সেই বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএসের নেতারা অতি সন্তর্পণে আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন শুধু নয়, নানা ভাবে ব্রিটিশকে সহায়তা করেছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলেই মানতে চাননি। আজও বিজেপি নেতা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে-ভাবে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি দেশগুলির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে চলেছেন, তাঁদের সাথে কোলাকুলি করছেন, তাতে কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দেশের নামে বিদেশি শব্দ, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, এই সব গল্পের আসল উদ্দেশ্য তাদের পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতা থেকে দেশের মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেশের নামের মতো একটি আবেগপূর্ণ বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা, তার মধ্য দিয়ে জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি, যেগুলি আসন্ন নির্বাচনের মূল ইস্যু হিসাবে এসে গিয়ে তাঁদের গুরুতর প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে, সেগুলিকে ভুলিয়ে দেওয়া এবং 'বিদেশি ইন্ডিয়ার' বিরুদ্ধে 'স্বদেশি ভারত'কে লড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনে ফয়দা তোলা।

দেশের মানুষকে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হতে হবে এবং বিজেপি সরকারের কাছে তাদের সমস্ত অপকর্মের কৈফিয়ত দাবি করতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে, দেশের নাম বদলের দ্বারা জীবনের কোন সমস্যাটার সমাধান তোমরা করবে? তোমরাই তো নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এনে শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণ করে দেশের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার নামে শিক্ষার জগত থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছে। দেশ বলতে তোমরা বোঝো শুধু আদানি-আম্বানিদের, তাই দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং দেশের সম্পদকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছ। ভারত নামের প্রবক্তা তোমরাই তো বিলকিস বানোর ধর্ষণকারী ও তাঁর আত্মীয়দের খুনিদের সাজা শেষ হওয়ার আগেই জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছ। কাজেই, এই 'ভারত বনাম ইন্ডিয়া' তরজা যে ২০২৪ নির্বাচনের আগে তোমাদের হাতে আর একটি তুরুপের তাস, মানুষের তা বুঝতে বাকি নেই।

টাকার পাহাড়ে বসে বিজেপি
অন্যেরাও কম যায় না

কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির সম্পদ প্রতি বছর উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মধ্যে ধনীতন রাজনৈতিক দল বিজেপি।

এডিআর-এর এই রিপোর্ট বলছে, ২০২০-'২১-এর তুলনায় ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-'২২-এ বিজেপির সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৬৪ কোটি টাকায়। জানা যাচ্ছে, দেশের সব ক'টি জাতীয় রাজনৈতিক দলের মোট সম্পদের ৬৮ শতাংশই রয়েছে বিজেপির দখলে।

এই একই সময়ে, অর্থাৎ গত এক বছরে ১১০ কোটি টাকা বেড়ে কংগ্রেসের সম্পদ পৌঁছেছে ৮০৫ কোটি টাকায়। ২০২১-'২২-এ সিপিআই(এম)-এর দখলে রয়েছে ৭৩৫ কোটি টাকার সম্পদ। এই সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫৮ কোটি টাকায়।

দেশের সব ক'টি জাতীয় রাজনৈতিক দলের মোট সম্পদ বৃদ্ধির একটি হিসাবও পাওয়া যাচ্ছে এডিআর-এর রিপোর্টে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-'০৫-এর তুলনায় ২০২১-'২২-এ দলগুলির মোট সম্পদের বৃদ্ধি হয়েছে ১৯৪৭ শতাংশ। ২০০৪-'০৫-এ মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৩১.৩৩ কোটি, যা ২০২১-'২২-এ পরিণত হয়েছে ৮ হাজার ৮২৯ কোটিতে।

এই সমস্ত হিসাবের সূত্র হিসাবে এডিআর নির্বাচন কমিশন ও আয়কর দফতরে দাখিল করা দলগুলির অডিট করা হিসাবপত্রের কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ এই বিপুল সম্পদের সবটাই বৈধ ও সরকারি হিসাব। ভোট রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা এই রাজনৈতিক দলগুলির, এর বাইরেও যে আরও বহু হিসাব-বহির্ভূত সম্পদ আছে, তা নিয়ে আজ আর কারওর সন্দেহ থাকার কথা নয়। এই টাকার উৎস কী? বৃহৎ পুঁজির মালিক ধনকুবেররা টাকা না ঢাললে এত বিপুল সম্পদ অর্জন যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। জনসেবার নামে এই সমস্ত দলগুলি ক্ষমতায় বসে এইসব পুঁজিমালিকদের মুনাফার স্বার্থে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে শোষণের নিত্যনতুন কলাকৌশল প্রয়োগ করে। তার বিনিময়েই তাদের মিলেছে এই বিপুল সম্পদের মালিকানা।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৭৬ বর্ষ ৫ সংখ্যায় 'শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী ভবন উদ্বোধন' প্রতিবেদনে ভুলবশত লেখা হয়েছে 'সুবোধ ব্যানার্জী কলকাতায় একটা মেসে থেকে টিউশন করতেন। পরিবারের জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকিটা দলকে সাহায্য করতেন।' এর পরিবর্তে হবে 'মেস চালানোর জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকিটা দলকে সাহায্য করতেন।' অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ওই সংখ্যাতেই 'স্বরূপনগরে কৃষক বিক্ষোভ' সংবাদে পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ১২০০০ টাকার জায়গায় ২০০০ টাকা ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। —সম্পাদক, গণদাবী

বিজেপির চরম শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী নীতিতেই সিলমোহর দিল তৃণমূল সরকার

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ৯ সেপ্টেম্বর 'গেজেট নোটিফিকেশন'-এর মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গত তিন বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীরা গোল গোল কথায় অর্থহীন কিছু বিরোধিতা করে রাজ্যের জন্য আলাদা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার কথা বলে রাজ্যে পর পর দু'টি শিক্ষা কমিটি গঠন করেছিল। প্রথম কমিটির রিপোর্ট কী তা কেউই জা১নতে পারলেন না। তারপর কেন আরেকটি কমিটি গঠনের প্রয়োজন পড়েছিল তাও খোলসা করে সরকার বলেনি। শেষ পর্যন্ত যে শিক্ষানীতি রাজ্য সরকার ঘোষণা করল তা কথার সামান্য কিছু হেরফের ছাড়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিরই কার্বন কপি।

রাজ্যের শিক্ষানীতিতে দেখা যাচ্ছে, স্কুলশিক্ষাকে তারা ৫+৪+২+২ হিসাবে ভাগ করেছে। প্রথম ৫ বছরের স্তরটি হল সরকারি বা বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিকের এক বছর সহ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত, দ্বিতীয় স্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। নবম, দশম ও একাদশ, দ্বাদশ চারটি শ্রেণি নিয়ে শেষ দুটি স্তর। কেন্দ্রের শিক্ষানীতিতে স্কুলস্তরকে ৫+৩+৩+৪ হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। সেই স্তরগুলি হল, অঙ্গনওয়াড়িতে তিন বছর বয়সে ভর্তি হয়ে তিন বছর সেখানে কাটিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পড়বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এইটি হল পাঁচ বছরের ভিত্তিস্তর। তৃতীয় থেকে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি হল পরের দু'টি স্তর। নবম থেকে দ্বাদশ হল চতুর্থ স্তর। কেন্দ্রের শিক্ষানীতি অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করতে ১৫ বছর লাগবে। রাজ্য সেই ভাগকে একটু অন্যরকম করে ৫+৪+২+২ বললেও অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষায় শিশুর তিন বছর বয়সে ভর্তি হয়ে দু'বছর কাটানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করতে সেই ১৫ বছরই লাগবে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দু'দুটি কমিটি করার পর যে শিক্ষানীতি তারা ঘোষণা করেছেন, তাতে এইটুকু পার্থক্য তারা করাতে পেরেছেন!

কলেজ স্তরের শিক্ষা কিংবা শিক্ষার বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাথে কোনও পার্থক্যই রাখেনি।

ঘোষিত রাজ্য শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল,

- শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ আর্থিক দায় অস্বীকার করে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে উৎসাহিত করা। গবেষণা ও শিক্ষার জন্য সরাসরি বেসরকারি মালিকদের উপর নির্ভরশীলতা। কেন্দ্রের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় কমিয়ে পিপিপি মডেল বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎসাহ, যা বেসরকারিকরণকেই ত্বরান্বিত করবে।
- প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ের তিন বছর বয়স থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইউনিক আইডেন্টিটি কার্ড চালু করা হবে। তাতে শৈশব থেকে কোন শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার কেমন মান ছিল তার উল্লেখ থাকবে। তার ফলে গরিব ঘরের সন্তান — যারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে প্রথম জীবনেই নিম্নমানের শিক্ষা নিতে বাধ্য হবে। তারা পরবর্তীকালে ভাল ফল করলেও ইউনিক আইডেন্টিটি কার্ডে উল্লেখিত সেই নিম্নমানের বোঝা তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।
- স্কুল ও কলেজ উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি না করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে ক্লাস্টার গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্কুল স্তরে সারা রাজ্যে ১,৩১৩টি ভাল স্কুলকে চিহ্নিত করে এক একটি ভাল স্কুলের সাথে কাছাকাছি এলাকার ১০টি করে স্কুলকে জুড়ে দেওয়া হবে। তারা ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, জিমন্যাসিয়াম, শিক্ষক ও অন্যান্য সম্পদ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে। ফলে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, শ্রেণিকক্ষ বা অন্যান্য সরঞ্জামের অভাব পূরণের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের ক্লাস্টার ধরে নানা প্রতিষ্ঠানে ছোটাছুটি করে পড়াশোনার কাজ চালাতে হবে। অভিভাবকদেরও তাদের সন্তানদের নিয়ে নিজ-স্কুল ছেড়ে এই স্কুল-সেই স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। ফলে শিক্ষার নতুন পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব কার্যত অস্বীকার করে হয়রানি বাড়ানোর ব্যবস্থাই রাজ্যের শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে।
- বিজেপির পথ অনুসরণ করেই এই শিক্ষানীতিতে ত্রিভাষা সূত্রের প্রয়োগ চেয়ে কৌশলে হিন্দি চাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি থেকেই সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হবে। স্কুলস্তরে সেমিস্টার পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে।
- শিক্ষার মূল্যায়ন সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে— বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরীক্ষা, চাপ ও উদ্বেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার কোনও কথা এতে নেই। বোঝা যায় জাতীয় শিক্ষানীতির সুরেই পাশ-ফেল প্রথাবিহীন মূল্যায়নের কথাই বলা হয়েছে একটু ঘুরিয়ে
- এই রাজ্য শিক্ষানীতি ঘোষণার আগেই পরিকাঠামোর কোনও রকম উন্নতি না করে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ না করে কলেজ স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স আগেই রাজ্য সরকার চালু করেছে। তিন বছরের অনার্স সহ ডিগ্রি কোর্সের জায়গায় সরকার চার বছরের কোর্স করে ছাত্রদের ঘাড়ে একটি বছর বাড়তি চাপিয়ে দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত চার বছরের ডিগ্রিকোর্সে যা যা বলা হয়েছে অর্থাৎ মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স, মাল্টিপল এন্ট্রি ও এক্সিট, অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটের উদ্ভট ব্যবস্থা সবই রাজ্য বহাল রেখেছে। এর ফলে শিক্ষার শৃঙ্খলা পুরোপুরি বিনষ্ট হবে।
- বিজেপির রাস্তাতেই স্কুলস্তর থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ায় কোনও বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন, বিষয়ের গভীরে ঢোকা ইত্যাদি কোনও কিছুই হবে না, যা শিক্ষার প্রাণসত্তাকে ধ্বংস করে দেবে।
- কেন্দ্রের মতোই রাজ্য শিক্ষানীতিতে অনলাইন, ডিজিটাল, অ্যাপভিত্তিক ও দূরায়ত শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে গরিব ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এবং ফোনে নিয়মিত রিচার্জ করতে শিক্ষার্থীদের উপর বিপুল পরিমাণে আর্থিক বোঝা চাপবে।

এই সমস্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন দলবাজি। পরিস্থিতি এত অবনমিত হয়েছে যে, দু'পক্ষই অতি নিকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে একে অপরকে আক্রমণ করছে। এই আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আচার্য হিসাবে রাজ্যপালের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু রাজ্যপাল কখনও অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, কখনও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস, কখনও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন অধ্যাপককে উপাচার্য পদে নিয়োগ করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ব্যতিরেকেই। রাজ্যপাল এই সুযোগ পাচ্ছেন, কারণ এই পরিবেশ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই তৈরি করেছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের একের পর এক যে সংশোধনীগুলি বিধানসভায় পাশ করেছে তার সুযোগ নিচ্ছেন রাজ্যপাল তথা বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির স্বার্থসিদ্ধি করতে রাজ্যপাল সেই আইনের অপব্যবহার করছেন। দুই পক্ষের ভূমিকাতেই বিশ্বদ্যালয়গুলিতে চরম অব্যবস্থা ও অচলাবস্থা চলছে। এদিকে এই অজুহাতেই রাজ্য সরকার রাজ্যপালের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে বসানোর প্রচেষ্টায় আইন সংশোধন করেছিল। যদিও তা এখনও রাজ্যপালের অনুমোদন পায়নি। এর বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ হয়। বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদরাও তাতে সামিল হন। কেন্দ্র না রাজ্য কোন ক্ষমতাসীন দল তা নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে উভয়পক্ষ নোংরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধিকার ধ্বংস করতে দু'পক্ষই তৎপর। শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ গৌণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালুর দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এ রাজ্যের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক সহ সকল শিক্ষানুরাগী মানুষকে শিক্ষাকে ধ্বংস করার বিপুল এই সরকারি আয়োজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে

রাজ্যের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিটে ছাত্রবিক্ষোভ। ৯ সেপ্টেম্বর

রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের হীন দখলদারি বন্ধ করে
উচ্চ শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচানোর দাবিতে এবং
জনবিরোধী রাজ্য শিক্ষানীতির প্রতিবাদে
শিলিগুড়ি ও কলকাতায়
বিক্ষোভ মিছিল
১৪ সেপ্টেম্বর ॥ দুপুর -১টা
জমায়েত - কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা
বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
SUCI (Communist)

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক পৌরসভার রত্নালি রাধাবল্লভপুর স্টপেজ থেকে নিমতলা গঙ্গাখালি পুলিশ গেট পর্যন্ত রাস্তাটির পূর্ণ সংস্কারের দাবিতে ৩০ আগস্ট রাস্তা উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধে স্থানীয় দোকানদাররাও যোগ দেন। কমিটির সম্পাদক জয়দেব জানা, সভাপতি দীপঙ্কর শাসমল জানান, তমলুক থানার আইসি অবরোধস্থলে এসে কথা দিয়েছেন, প্রশাসনকে তিনি বিষয়টি জানাবেন। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রাইস কমিশনে পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ১৩ হাজার টাকা করার দাবি এআইকেকেএমএস-এর

২০২৪-২৫ সালের পাটের সহায়ক মূল্য নির্ধারণের জন্য ৫ সেপ্টেম্বর টালিগঞ্জের টলি ক্লাবে জেসিআই-এর আয়োজনে 'কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট অ্যান্ড প্রাইস'-এর সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয় পাল শর্মার উপস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন জোরালো ভাষায় পাট চাষিদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, এ বছর কাঁচা পাটের সরকারি সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৫০৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা কুইন্টালপ্রতি পাট উৎপাদন খরচের প্রায় অর্ধেক। সভায় উৎপাদন খরচের এক তালিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, এক কুইন্টাল পাট উৎপাদনের খরচ প্রায় ৯০০০ টাকা।

সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড গোপাল বিশ্বাস

সরকারের দ্বারা গঠিত ডঃ স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ ছিল ফসলের সহায়ক মূল্য হওয়া উচিত উৎপাদন খরচের দেড়গুণ। সেই হিসাবে সহায়ক মূল্য কমপক্ষে ১৩ হাজার টাকা হওয়া উচিত। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের প্রতিনিধি পাটের এমএসপি কুইন্টাল প্রতি ৬,৫০০ টাকার সুপারিশ করেন। সিপিএমের কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন ৮,৫০০ টাকা কুইন্টাল, যা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম। কমরেড গোপাল বিশ্বাস ক্ষোভের সাথে বলেন, এই সহায়ক মূল্য কৃষক সহায়ক নয়। বহু চাষি পাট চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

পাট শিল্পের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিন্থেটিক লবির কাছে আত্মসমর্পণ করে সরকার পাট চাষ ও পাটশিল্পকে ধ্বংস করছে। অথচ পাট চাষ পরিবেশবান্ধব। পরিবেশের কথা ভেবেই সিন্থেটিকের পরিবর্তে পাটে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই শিল্প শ্রমনিবিড়, ৪০ লক্ষ পরিবার পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। পাট গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্থকরী ফসল, বিশ্বে মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৫০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়।

এআইকেকেএমএস-এর দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ক্রয়কেন্দ্র খুলে জেসিআই-কে সরাসরি চাষিদের থেকে পাট কিনতে হবে। সস্তায় চাষিদের সার্টিফায়েড বীজ দিতে হবে। সভায় সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বপন দেবনাথ ও দাউদ গাজি।

গ্রামীণ ডাক্তারদের সার্টিফিকেট প্রদান

৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কোর্সের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও আটটি সেন্টার থেকে ২০২২-২৩ সেশনে উত্তীর্ণ ট্রেনি সহ দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহসভাপতি ডাঃ ভবানীশংকর দাসের

গান দিয়ে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কোর্সের পরিচালন সমিতি সেন্ট্রাল কোর্স কন্ডাকশন কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ বিজ্ঞান বেরা ও ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, অন্যতম সহসভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, পিএমপিএআই-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, কোর্সের চিফ এগজামিনার সিস্টার প্রীতি তারণ সহ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক।

মঞ্চে উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্য শেষে সফল ট্রেনিদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং-এর প্রতিকৃতি এবং তাঁর একটি কোটেশন সহ সুদৃশ্য স্মারক উপহার দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কোর্স পরিচালন কমিটির সেক্রেটারি ডাঃ নীলরতন নাইয়া।

দিল্লিতে আশাকর্মীরা ধর্মঘটে

সারা দেশেই আশাকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অথচ সামান্য ভাতা ছাড়া তাঁদের কিছুই জোটে না। এই অবিচারের প্রতিবাদে দিল্লির আশা কর্মীরা ৫ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের ডাক দেন। সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন, কাজ ভিত্তিতে ইনসেন্টিভ দেওয়া, বর্তমান ইনসেন্টিভ অন্তত চার গুণ বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবিতে হাজার হাজার আশাকর্মী দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এই ধর্মঘটে সামিল হন। ৬ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে সিভিল লাইনে ধরনায় সামিল হন দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তের আশাকর্মীরা। তাঁরা বলেন, দাবি না মানলে আশাকর্মীদের আন্দোলনের ঢেউয়ে সরকার ভেসে যাবে।

সম্পাদক ঊষা ঠাকুর, উপদেষ্টা প্রকাশ দেবী, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক ম্যানেজার চৌরাসিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ককর্মীদের জাতীয় কনভেনশন দিল্লিতে

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ডাকে ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধন) বিল ২০২১ প্রত্যাহার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল, উন্নত গ্রাহক পরিষেবার স্বার্থে সমস্ত ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়মিত কর্মী নিয়োগ, ব্যাঙ্কশিল্পে বেতন ও চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্রুত নিষ্পত্তি, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ না করা, স্থায়ী কাজে নিযুক্ত কন্ট্রাক্ট-ক্যাজুয়াল সহ সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিতকরণ, পার্ট-টাইম কর্মীদের ফুল-টাইম কর্মীতে পরিণত করা, অস্থায়ী কর্মীদের যথেচ্ছ ছাঁটাই না করা, সমকাজে সমবেতন, বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ধনকুবেরদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে ব্যাঙ্কশিল্পকে দুর্বল না করা, পেনশন আপডেট করা, এনপিএস বাতিল করে পুরাতন পেনশন চালু, আমানতে সুদ বৃদ্ধি, গ্রাহক পরিষেবা শুল্কের ক্ষেত্র এবং পরিমাণ কমানো, চারটি শ্রমিক বিরোধী 'শ্রম কোড' বাতিল প্রভৃতি দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ব্যাঙ্ককর্মীরা দিল্লি অভিযান করেন।

নেতৃত্ব দেন ফোরামের সভাপতি বিজয় পাল সিং এবং সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল। ফোরামের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশে অর্থ দফতরে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

ওই দিনই জাতীয় স্তরের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লির রানি ঝাঁসি রোডে আম্বেডকর ভবন হলে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল সিং।

প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন কনভেনশনের প্রধান অতিথি, এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রমেশ পরাশর। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ফোরামের দুই সহ-সভাপতি ভেদরাম সিং এবং পূর্ণ চন্দ্র বেহেরা, কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার, বলরাম যাদব (হরিয়ানা), আশা প্রজাপতি (মধ্যপ্রদেশ), অতুল শর্মা (নতুন দিল্লি), স্বপন দাস (আসাম), অজয় বাবু ও অরবিন্দ শর্মা (উত্তরপ্রদেশ), ইউসুফ মোল্লা ও বিজয় লোধ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং নর্দান ডুকপা (সিকিম)। তাঁরা সমস্ত স্তরের ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে সরকারের মালিক তোষণকারী, জনবিরোধী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

পাঠকের মতামত

পাশ-ফেল না থাকাটা ওদের জন্য অভিশাপ

আকাশ দলবেরা, দেবাশীষ ঘাঁটী, লক্ষীকান্ত ঘাঁটী— আরও কত নাম। এদের আপনারা চেনেন না। চেনার কথাও নয়। এরা সব স্কুলছুট পড়ুয়া। এরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের প্রতিনিধি। আক্ষরিক অর্থেই পিছিয়ে পড়া, সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে। আর্থিক অনটন এদের নিত্যসঙ্গী। তবে শুধু আর্থিক অনটনের কারণেই এরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এমনটা নয়। স্কুলের পরীক্ষায় পাশ-ফেল না থাকাটা এদের জীবনে অনেকটা অভিশাপের মতো। অনেকদিন আগে পূর্বতন সিপিএম সরকার প্রাথমিকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল। সেই একই পথ অনুসরণ করে বর্তমান রাজ্য সরকার আর এক ধাপ এগিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা কংগ্রেস সরকার প্রবর্তিত শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯কে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করেছে। যদিও শিক্ষা রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ তালিকাভুক্ত।

একটা সময় কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক গণমাধ্যম ঢালাও প্রচার চালিয়েছে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পক্ষে। অনেক যুক্তির মাঝে এই যুক্তিও তুলে ধরা হয় যে পাশ-ফেল না থাকলে স্কুলছুটের সংখ্যা কমবে। খাতায় কলমে আজও এই পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। আকাশ, দেবাশীষ, লক্ষ্মীকান্তরা স্কুল ছাড়তে একরকম বাধ্য হয়েছে পাশ-ফেল না থাকার বদান্যতায়। এরা সকলেই হুগলি জেলার খানাকুল ২ নং ব্লকের ঘোড়াদহ গ্রামের বাসিন্দা। এক বছর আগেও এরা এই গ্রামের সুধান্যচরণ হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। শেষ কয়েক মাস যাবত এরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। এদের সাথে কথা বলে জানা যায় এদের স্কুলে যেতে অনীহার প্রধান কারণ এরা কেউ অষ্টম শ্রেণি, কেউ নবম শ্রেণিতে উন্নীত হলেও ঠিক মতো রিডিং পড়তে পারে না, অক্ষর পরিচয়েও ঘাটতি আছে, প্রাথমিক স্তরের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এরা করতে পারে না। এতে স্কুলের অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে, এমনকি কখনও সখনও শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে এরা হাসির পাত্র হয়। এরা একরকম হীনমন্যতায় ভোগে। পাশ-ফেল না থাকার কারণে প্রাথমিক স্তর থেকেই এরা কতটুকু শিখেছে তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। এমনকি কেউ যদি অকৃতকার্য হয়ে থাকে তাহলেও তাকে পরের ক্লাসে উন্নীত করা হয়েছে সরকারি নিয়মানুসারে। তাই স্বাভাবিক নিয়মে যে ছেলেটি বা মেয়েটি প্রাথমিক স্তরের পড়া বুঝতে পারছে না, তার কাছে অষ্টম কিংবা নবম শ্রেণির পড়া বুঝে ওঠা এভারেস্ট জয় অপেক্ষাও দুরূহ বিষয় বলে মনে হচ্ছে। তাই ওরা আর কোনও অবস্থাতেই স্কুলমুখী হতে চায় না। ওদের অভিভাবকদের সহযোগিতা সত্ত্বেও, আমি এবং আমার বন্ধুরা ওদের বাড়িতে গিয়ে অনেক বুঝিয়েও ওদের স্কুলমুখী করতে পারিনি। স্কুলে যাবে না বলে একরকম ধনুকভাঙা পণ করেছে ওরা।

সরকার জামা-জুতো-মোজা, বই-খাতা, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করেছে, শুধু পঠন-পাঠন যাতে সঠিক ভাবে হয় সেই ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত কোথাও ৮০ ঃ ১, আবার কোথাও ১০০ ঃ ১। বেশিরভাগ স্কুলেই ছাত্রছাত্রী প্রচুর, কিন্তু আনুপাতিক হারে শিক্ষক নেই। যদিও মূলধারার গণমাধ্যমে ব্যতিক্রমী ভাবে যে দু-একটি স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা তুলনায় বেশি কিন্তু পড়ুয়া কম সেই খবরই বেশি বেশি প্রচারিত হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার হয়তো একদিন পুনরায় পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনবে, ততদিনে একটা বৃহত্তর অংশের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী প্রকৃত শিক্ষার আলো না পেয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। তবে এর মধ্যেও একটা খুশির খবর, অনেকের সহযোগিতায় আকাশ দলবেরা নামের ছাত্রটিকে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আকাশ কি তারা হয়ে জ্বলবে না অচিরেই অন্য তারা খসার ভিড়ে হারিয়ে যাবে?

জিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

নেতাজির পাশে দাঁড়িয়েছিল ঐক্যবদ্ধ মণিপুর

সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করছেন, গত মে মাস থেকে দুই জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক দাঙ্গায় মণিপুর অগ্নিগর্ভ। গোষ্ঠী সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু শিবিরে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে শত শত বাড়িঘর। আশ্রয় শিবিরে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রহর গুনছেন কবে শান্তি আসবে, আগুন নিভবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল মানুষ ভাবছেন কোন পথে শান্তি সম্ভব। কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠছে এমন বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আদৌ কি সম্প্রীতি সম্ভব? যদি সম্ভবই হবে তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন তিন মাস ধরে নীরব থেকে সংসদে তাঁর আড়াই ঘন্টার বক্তৃতায় মণিপুর নিয়ে মাত্র ৫ মিনিট সময় দিলেন? তাও বললেন কিছু ভাসা ভাসা কথা! কেন তিনি সম্প্রীতি আনতে এতটুকু সক্রিয় হচ্ছেন না? তাঁর আচরণ থেকে এই অভিযোগ উঠছে ভোট লালসায় বিজেপির ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি মণিপুরের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। অভিযোগ উঠছে নানা কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও। সব মিলিয়ে সাধারণভাবে যে কোনও মানুষের মনে হওয়া স্বাভাবিক অত্যন্ত জটিল এই আবর্ত থেকে মুক্তির পথ হয়ত অধরা।

কিন্তু সত্যিই কি মুক্তির পথ নেই? সত্যিই কি ঐক্য সংহতি সম্প্রীতি অসম্ভব? অথচ ইতিহাস বলছে, এই বৈরিতা চিরকালের নয়। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে কীভাবে মণিপুরের কুকি, মেইতেই বা নাগা জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন, রাজনীতি ও সংগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থে কৃষ্ণা বসু এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করেছেন। মণিপুরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আইএনএ বাহিনীকে সমর্থন শুধু দিয়েছিল তা নয়, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিহাস হল, ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল আইএনএ বাহাদুর গ্রুপের সৈন্যরা এবং শত শত স্থানীয় মানুষ মণিপুরের লোকতক হ্রদের পাশে মইরাং শহরে সমবেত হন। সেদিন ছিল মেইতেইদের নববর্ষ। শওকত মালিক সেখানে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে ভাষণ দেন। হিন্দুস্তানি সেই ভাষণ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এম কৈরেং সিং, যিনি ১৯৬০ সালে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। স্থানীয় জনগণ এই বাহাদুর গ্রুপের সেনাদের চাল, সবজি, লোকতক হ্রদের মাছ ইত্যাদি দিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছেন। মৈরাং-এর আরেকজন স্থানীয় মানুষ এইচ নীলামণি সিং, যিনি মণিপুরের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন, ১৯৪৪ সালে তাঁর পরিবার শওকত মালিককে নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। শওকত মালিক এই বাড়িতেই তার সামরিক কমান্ড সেন্টার স্থাপন করেন।

১৯৪৫ সালে যখন আইএনএ বাহিনীকে পিছু হঠতে হয়, তখন ১৭ জন মণিপুরী যুবক তাদের সাথে যান। এর মধ্যে কৈরং সিং, নীলামণি সিং সহ চারজন ছিলেন মৈরাং-এর। বাকিরা ছিলেন ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগঠন মণিপুরী মহাসভার সদস্য। এই ১৭ জনের মধ্যে দু-জন ছিলেন মহিলা— কিন্য দেবী এবং রণধনি দেবী। দীর্ঘ দু'মাস পাহাড় নদী বন জঙ্গল পেরিয়ে বার্মার রেঙ্গুনে এই ১৭ জনের গ্রুপ নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নীলামণির বাবা তার পারিবারিক সঞ্চয় ৩০০০ টাকা তাকে দিয়ে বলেছিলেন, যদি নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে পারো এই টাকাটা দিও। নীলামণি নেতাজির হাতে তা তুলে দেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে ব্রিটিশরা রেঙ্গুন পুনর্দখল করলে এই দেশপ্রেমিক সতেরো জন যুবক ব্রিটিশের হাতে বন্দি হন। ব্রিটিশ সরকার তাদের আটক করে রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলে। ৭ মাস পর তাঁদের কলকাতায় আনা হয়। ১৯৪৬ সালের মে মাসে তাঁরা মুক্ত হন। মণিপুরে ফিরে গেলে সেখানকার মানুষ তাদের প্রবল উচ্ছ্বাসে স্বাগত জানান বীরের মর্যাদা দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ ভারতের অন্যান্য অংশে যেমন নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন এনে দিয়েছিল, এমনটাই ঘটেছিল মণিপুরেও। মণিপুরে মেইতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোটামুটি দশ শতাংশ মুসলিম। ইম্ফল উপত্যকায় বসবাসকারী এই মুসলিমরা পঙ্গল নামে পরিচিত। আইএনএ বাহিনীর মুক্তি সেনা মোহম্মদ নাকি ছিলেন পঙ্গল গোষ্ঠীর মানুষ। তিনি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির সিপাই ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন।

আজকের বিক্ষোভের অন্যতম কেন্দ্র চূড়াচাঁদপুরের সৈকত গ্রামে পাহাড়ের উপর একটা বিশাল আই এন এ ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পে নেতাজি এসেছিলেন। যে গাছতলায় নেতাজি বসেছিলেন, গ্রামবাসীরা পরম শ্রদ্ধায় তার যত্ন নেন। এই গ্রাম ছাড়ার আগে নেতাজি সৈকত গ্রামের রাজা কলবেলকে বলেন, আমি জানি এই এলাকার মানুষ আইএনএ বাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ করে চলেছেন। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তাদের এই অবদান আমি ভুলব না। মেইতেই, পঙ্গল, কুকি সকলেই আইএনএ বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতি সহমর্মিতা গড়ে দিয়েছিল। মেইতেইরা ভুলতে পারেনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো-মণিপুর যুদ্ধে রাজপুত্র টিকেন্দ্রজিৎ সিং ও তাঁর জেনারেলদের ইম্ফলের মাটিতে ফাঁসি দেওয়ার কথা। কুকিরা ভুলতে পারেনি ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ অ্যাংলো-কুকি যুদ্ধে কুকিদের উপর ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারের কথা। নাগারাও এই সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে ছিল না। উখরুল মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে নাগা ন্যাশনালিজমের প্রবর্তক অনগামি ঝাপু ফিজো ১৯৪৪ সালে আইএনএ-তে যোগ দেন ।

এই ঐক্য সংহতি নষ্ট হতে শুরু করে স্বাধীন ভারতে। এর কারণ খুঁজতে গেলে চোখে পড়ে, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়েই সামরিক বাহিনীর অত্যাচার। ভারত সরকার— কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে বিজেপি শাসন পর্যন্ত, দানবীয় কালাকানুন তৈরি করেছে। জনগণের ক্ষোভের কারণগুলি ধৈর্য সহকারে শোনা এবং গণতান্ত্রিক পথে তার সমাধানের চেষ্টা না করে সরকার দমনপীড়নের পথ নিয়েছে। এর ফলে সরকারের সাথে জনগণের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোটের স্বার্থে গোষ্ঠীগত সেন্টিমেন্টে উস্কানি যা পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে কুকি, মেইতেই, নাগা সহ সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সেই কারণে তারা পরস্পরের বন্ধু। শোষণমুক্তির এই দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামে সব জনগোষ্ঠীর শোষিত মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের আদর্শকে হাতিয়ার করে। তবেই গড়ে উঠবে ঐক্য সংহতি সম্প্রীতির বাতাবরণ।

রাজ্যের শিক্ষানীতি

একের পাতার পর

সত্ত্বেও স্কুলস্তরে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার কোনও প্রস্তাবও এতে নেই। অনলাইন, ডিজিটাল ও মিশ্র পদ্ধতির উপর জোর দিয়ে গরিব ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষক নিয়োগের দায়ও ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মমুখী শিক্ষার নামে মৌলিক শিক্ষার সুযোগকে নষ্ট করা হচ্ছে। দুর্বল পরিকাঠামোর স্কুলগুলির উন্নতি না করে কয়েক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা স্কুলগুলির পরিকাঠামোয় সবার অংশীদার হওয়ার কথার দ্বারা চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হবে। আগে থেকেই রাজ্য সরকার পরিকাঠামো তৈরি না করে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উন্নতির উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

আমরা অবিলম্বে এই সর্বনাশা শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করার দাবি করছি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হওয়ার জন্য শিক্ষানুরাগী জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষে আচ্ছন্ন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষিকাও

সময়টা নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বর্ণিত ‘অমৃতকাল’। আর এই সময়টাতেই দেশে একটার পর একটা অভূতপূর্ব দৃশ্যের জন্ম হয়ে চলেছে। সমাজমাধ্যমের দৌলতে সম্প্রতি এমনই একটি দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে দেশের মানুষের। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওয় দেখা গেছে, এক শিক্ষিকার আদেশে ক্লাসের ছাত্ররা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৭ বছর বয়সী একটি ছাত্রের গালে এক এক করে এসে চড় মেরে যাচ্ছে। আরও জোরে মারার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা উগরে দিচ্ছেন শিক্ষিকা।

পরে জানা যায় এই কুৎসিত ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর জেলায় খুব্বাপুরের এক বেসরকারি স্কুলে। ছাত্রটির বাবা, পেশায় কৃষক মানুষটি প্রথমদিকে পুলিশে অভিযোগ করতে চাননি। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতকে ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ বানাবার বিজেপি-আরএসএস-এর ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে উৎসাহী ও উদ্যোগী রূপকার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে একজন সংখ্যালঘুর এমন অভিযোগ কোনও গুরুত্বই পাবে না। পরে দেশ জুড়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠায়, হয়তো কিছুটা সাহস পেয়েই তিনি পুলিশে অভিযোগ করেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ শিক্ষক-সমাজের কলঙ্ক ওই শিক্ষিকা তৃপ্তা ত্যাগীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে বটে, কিন্তু তা করেছে এমন কৌশলে যে, কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ঘটনার তদন্ত শুরু করতে হলেও আদালতের অনুমতি লাগবে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এমন জঘন্য ঘটনার পরে বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও বহাল তবিয়তে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন তৃপ্তা ত্যাগী।

তা বলে কিন্তু বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশের পুলিশ-প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় বলতে পারবেন না আপনি। শ্রেণিকক্ষে তার ধর্ম নিয়ে কটুকাটব্য করে সহপাঠীদের হাতে মার খাইয়ে একটি বালকের নিষ্পাপ মনে চিরদিনের জন্য অন্য ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বুনে দেওয়ার মতো চরম অপরাধ করলেন যে শিক্ষিকা, তাঁর বিরুদ্ধে আঙুলটি না তুললেও, যাঁরা এই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণ মহম্মদ জুবেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে ভুল হয়নি তাদের।

এই মহম্মদ জুবের অবশ্য বহুদিন ধরেই হিন্দুত্ববাদী শাসকদের বিষনজরে। তথ্যসন্ধানী ওয়েবসাইট ‘অল্ট নিউজ’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা এই তরুণকে গত বছরই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল। শেষে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। এবার নির্যাতনের এই ভিডিও ‘এক্স’ (আগেকার ‘টুইটার’)-এ পোস্ট করার পরে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা সংস্থার আপত্তিতে সাড়া দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জুবের সেটি তুলেও নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ রেহাই দেয়নি তাঁকে।

ছাত্র নির্যাতনের এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন— এমন ভাবলে ভুল হবে। সরকারি ক্ষমতায় বসার পর থেকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যেভাবে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার বিষধোঁয়া ছড়িয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটির সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শ্বাসরোধ করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, তৃপ্তা ত্যাগীর এই বর্বরোচিত কার্যকলাপ তার সঙ্গে ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায়। স্কুলের মতো শিশুদের কাছে অত্যন্ত নিরাপদ একটি জায়গাতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ ছাত্রটিকে যেভাবে চূড়ান্ত অবমাননার শিকার হতে হল, তা আরও একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরে ক্ষমতাদর্পী বিজেপির নোংরা সাম্প্রদায়িক আধিপত্যবাদী চেহারা। গলার জোরে ঘোষণা করে যায়, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুকে নত হয়েই থাকতে হবে সংখ্যাগুরুর অত্যাচারী বুটের নিচে। সেখানে গোরক্ষার নামে নির্বিচারে চলবে নির্মম হত্যা। দাঙ্গাকারীকে রেহাই দিয়ে জেল দেওয়া হবে অত্যাচারিতকে। প্রতিবাদ করলে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু। প্রয়োজনে পুড়িয়ে মারার বিধানও রয়েছে। গণতন্ত্র তো দূর, দেশের মাটিতে স্বাধীন মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকারকেও মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে কখনও নীরবে পরোক্ষভাবে, কখনও সোচ্চারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে সেইসব অপকর্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করাবেন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী। দেশ জুড়ে ধিক্কারের বন্যা বয়ে গেলেও মুখটি খুলবেন না প্রধানমন্ত্রী। সেই ভরসাতেই শিক্ষাদানের সমস্ত রীতিনীতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, এমনকি মানবিকতার রেশটুকুও বিসর্জন দিয়ে নিতান্ত বর্বরের মতো একটি কচি চারাগাছের বেড়ে ওঠাকে থেঁতলে দিতে দ্বিধা করেননি শিক্ষককুলের কলঙ্ক তৃপ্তা ত্যাগী। আর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে সরকারের কোপে পড়তে হয়েছে মহম্মদ জুবেরকে।

নির্যাতিত শিশুটির জীবনে এই কদর্য ঘটনা হয়তো গভীর ছাপ রেখে যাবে। সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে তার বেড়ে ওঠাটাই হয়তো খানিকটা বিপর্যস্ত হবে অত্যাচারী এই শিক্ষিকার জঘন্য আচরণে। কিন্তু আশার কথা, উত্তরপ্রদেশের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকার তথা কেন্দ্রের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যকামী নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই সমস্ত অপকর্মকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আজ সোচ্চারে ধিক্কার জানাচ্ছেন। ছাত্র নির্যাতনের এই ঘটনার বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে ওঠা ঝড় এবং দেশ জুড়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সুস্থ প্রতিবাদকেই আরও জোরালো, আরও শক্তিশালী করতে হবে গোটা দেশে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে দোষী শিক্ষিকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানে। যাতে আগামী দিনে আর কোনও তৃপ্তা ত্যাগী অন্য কোনও নিরীহ ছাত্রকে নিজের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ষকামী বিকৃত মানসিকতার শিকার বানাবার সাহস না পায়।

চোলাই বন্ধে সরব সাংবাদিক ও আন্দোলনকারীর গ্রেফতারির প্রতিবাদ

খড়গপুর শহরের ২৪ নং ওয়ার্ডের সাঁজোয়ালে পাটনা পাড়া সহ আশপাশের এলাকায় প্রকাশ্যে রমরমিয়ে চলছে চোলাই মদের ব্যবসা। এলাকায় মদ্যপদের হৈ-হুল্লোড়, অশালীন আচরণে পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে। সন্ধ্যে হলেই মহিলাদের পথ চলার সঙ্গী আতঙ্ক।

এর বিরুদ্ধে এলাকাবাসী মানুষ, বিশেষত মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার কাউন্সিলর ও পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানিয়ে এলেও পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। বরং কার্যত তাদের চোলাই কারবারিদের পক্ষ নিতেই দেখা যায়। প্রতিবাদ জানিয়ে বাসিন্দাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে খড়্গপুর টাউন থানায় গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন বাসন্তী দাসের নেতৃত্বে এলাকার মহিলারা। সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচী আনন্দবাজার পত্রিকাতে ২৭ আগস্ট এই সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযোগকারীদের বাড়ি ঘেরাও করে হুমকি দেয় চোলাই কারবারিরা। সে খবরও প্রকাশিত হয় পত্রিকায়। খবর প্রকাশের পরদিন জনৈকা আদিবাসী মহিলা দেবমাল্য বাগচী ও বাসন্তী দাসের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এলাকার বাসিন্দা সহ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সাংবাদিক ও প্রতিবাদী মহিলাকে হেনস্থা করতে চোলাই কারবারিরাই আদিবাসী মহিলার নাম দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করেছে পুলিশের কাছে। দেখা যায়, চোলাইয়ের বেআইনি কারবার রুখতে যে পুলিশ এতটুকু নড়ে বসেনি, তারাই এই অভিযোগ পেয়ে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের বিরুদ্ধে অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের ধারা প্রয়োগ করে দেবমাল্য বাগচী ও বাসন্তী দাসকে গ্রেফতার করে।

এই ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। এমনকি আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি পর্যন্ত এই ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন যে, তাঁরা যখন আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় এই ধারা প্রয়োগের দাবি তোলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই দাবি পুলিশ মানে না। অথচ খড়্গপুরের ঘটনায় পুলিশ সেই ধারারই অপপ্রয়োগ ঘটাচ্ছে।

খড়্গপুরের কৌশল্যাতে প্রতিবাদ সভা। ১০ সেপ্টেম্বর

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর খড়গপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশ-প্রশাসনের নির্লজ্জ আচরণের প্রতিবাদে ও অবিলম্বে সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচী ও বাসন্তী দাসের মুক্তির দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর শহরের ২৪ নং ওয়ার্ডের পুরাতন বাজার এবং কৌশল্যাতে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য গৌরীশঙ্কর দাস সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁদের আরও দাবি, মিথ্যা মামলা দিয়ে সাংবাদিক এবং ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না, সর্বত্র মদ এবং মাদকের প্রসার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং চোলাই-কারবারিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিপিডিআরএস-এর প্রতিবাদ ঃ খড়গপুরে সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচীকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার সহ সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

কর্মচারীদের বঞ্চিত করে মন্ত্রী, এমএলএ-দের ভাতা বাড়ানোর প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, যেখানে রাজ্য সরকার টাকার অভাবের অজুহাতে সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ বিভিন্ন ধরনের কর্মীদের প্রাপ্য ডিএ দিচ্ছেন না, মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা বেতন দিচ্ছেন বছরে ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাসের— যা এ রাজ্যে প্রায় ১১ বছর বাড়ানো হয়নি। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না, তখন রাজ্যের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের (যারা নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক বলেন) এত বেতন বৃদ্ধি অযৌক্তিক ও অমানবিক।

তাঁর দাবি, বেতন বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, শ্রমজীবী মানুষের বেতন বৃদ্ধি এবং কর্মী ও শিক্ষকদের প্রাপ্য ডিএ অবিলম্বে দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

সব রুটে ট্রাম বহাল রাখার দাবিতে
ধারাবাহিক আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

দূষণহীন ও কম খরচের যে ট্রাম ব্যবস্থা কলকাতা শহরের ঐতিহ্য, সেই ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার। এর ফলে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, নিত্যযাত্রী, প্রবীণ মানুষ, হাসপাতালের রোগী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী সহ জনজীবনের সমস্ত স্তরের মানুষই ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। হেরিটেজ আইন বাঁচাতে মেয়র সম্প্রতি বলেছেন, চারটি রুটে চালু রেখে বাকি রুটগুলি থেকে তাঁরা ট্রামলাইন তুলে ফেলবেন। মেয়রের এই বক্তব্যে নাগরিকরা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় কলকাতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত রুটে পুনরায় ট্রাম অবিলম্বে চালু করা, ট্রামের কোনও সম্পত্তি বিক্রি না করার দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে কলকাতা জুড়ে লাগাতার স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। ৮ সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার, মানিকতলা, রাসবিহারী মোড়, দেশপ্রিয় পার্ক সহ মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ ভিড় করে এসে স্বাক্ষর দেন। সংগৃহীত এই সব স্বাক্ষর বিশেষ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে। এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী বলেন, সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে, ততদিন আমরা নানা ভাবে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলব। স্বাক্ষর সংগ্রহও চলবে।

ট্রাম বহাল রাখার দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

মহান মাও সে তুং স্মরণ

৯ সেপ্টেম্বর মহান মাও সে তুং স্মরণদিবসে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের পথ অবরোধ

ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তি মোড়ে অবরোধে সামিল হন কয়েক শত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা। সাধারণ সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা অত্যন্ত কম বেতনে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছেন। ন্যূনতম মাসিক বেতন ২৮ হাজার টাকা করার দাবিতে আন্দোলন চলছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া হল, স্বল্প বেতনের এই কর্মীদের উপর উপভোক্তাদের জন্য দেয় পরিপূরক পুষ্টি খাতের টাকা মাসের পর মাস বাকি রেখে তা চালিয়ে যেতে বাধ্য করানো হচ্ছে।

সবজি ও ডিমের খরচ প্রাথমিক ভাবে কর্মীদের নিজেদের থেকে দিতে হয়, তারপর এই খরচ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পরের মাসে দেওয়ার কথা থাকলেও তা প্রায় ৩-৪ মাস বাকি পড়ে আছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের দেয় নামমাত্র সাম্মানিকও মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে।

তিনি বলেন, অবিলম্বে সেন্টারের নামে সিমকার্ড সহ অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া ও অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। অক্টোবর মাস জুড়ে জেলায় জেলায় অবস্থান ধরনা হবে।

দার্জিলিংয়ে সিএমওএইচ অফিস
ঘেরাও আশাকর্মীদের

১১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার জিটিএ-ভুক্ত পাহাড়ের পাঁচটি ব্লক নিয়ে সিএমওএইচ অফিস ঘেরাও করা হয়।

আশাকর্মীরা স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে অতিরিক্ত বহু কাজ প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে দিনের পর দিন করে চলেছেন। জিটিএ-র অন্তর্গত পাহাড়ের আশাকর্মীরা ইউনিফর্ম, আইডেন্টিটি কার্ড পর্যন্ত পাননি। তাঁরা ইন্সেন্টিভ ঠিকমতো পাচ্ছেন না, মোবাইল রিচার্জের টাকাও পাচ্ছেন না। দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের জন্য আশাকর্মীদের কাজ করতে খুবই অসুবিধা হয়। সেই কারণে জিটিএ-র কাছে মাসিক ১০ হাজার টাকা ফিক্সড দেওয়ার দাবিও করা হয়। আশাকর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ফিক্সড ভাতা বৃদ্ধি, ইন্সেন্টিভ প্রতি আইটেমে তিনগুণ করা, মোবাইল সহ বিভিন্ন দাবিতে এ দিন ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। জেলা আধিকারিকরা ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ নমিতা চক্রবর্তী, এআইইউটিইউসি জেলা সম্পাদক জয় লোধ এবং দিলু গুরুং, নিশা তামাং, সুজাতা খাওয়াস, মমতা রাই, শোভা গুরুং, রিতু রাই, সারিকা রাই সহ পাহাড়ের পাঁচটি ব্লকের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এক হাজার আশাকর্মী বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

সংগ্রহ করুন

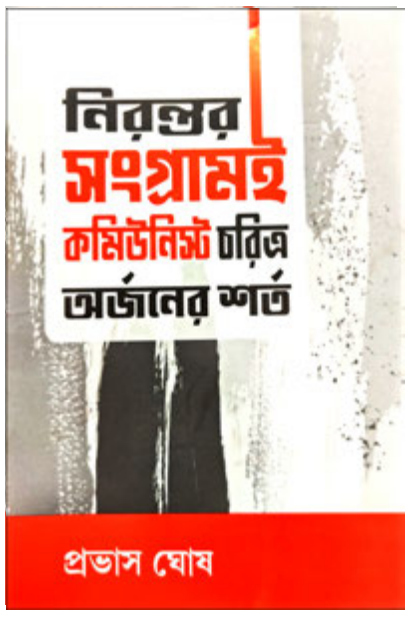

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com